–আপনার কথামতো স্যার আমি মিস্টার মিত্রের কয়েকজন প্রতিবেশী আর কলিগকে জেরা করি। জেরায় আমি লখনউয়ের নামটা পাই। মিস্টার মিত্র নাকি বছরে একবার করে লখনউ যেতেন। অফিসে বলতেন ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন আর প্রতিবেশীদের বলতেন অফিসের কাজে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারটা জেনে স্যার আমার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। তাই সেই অমূল্য রতন খুঁজতে আমি পরদিনই লখনউ যাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, লখনউ আমাকে খালি হাতে ফেরায়নি।

–একটু স্পষ্ট করে বলবে তন্ময়?

জেরায় আমি লখনউয়ের নামটা পাই। মিস্টার মিত্র নাকি বছরে একবার করে লখনউ যেতেন। অফিসে বলতেন ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন আর প্রতিবেশীদের বলতেন অফিসের কাজে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারটা জেনে স্যার আমার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। তাই সেই অমূল্য রতন খুঁজতে আমি পরদিনই লখনউ যাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, লখনউ আমাকে খালি হাতে ফেরায়নি

–শুনুন স্যার, তা হলে প্রথম থেকে বলি। মিস্টার মিত্রের বাবা শিবদাস মিত্র ছিলেন লখনউয়ের নামকরা উকিল। তার দুই ছেলে। এক ছেলে শশধরবাবু ছিলেন মেধাবী ছাত্র, পরবর্তীকালে তিনি একটা বড় চাকরি পান। অন্যদিকে অপর ছেলে সঞ্জয়বাবু ছিলেন পড়াশোনায় গোল্লা। কুসঙ্গে পড়ে মদ, গাঁজা আর জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। শিবদাসবাবু তাকে সেখান থেকে বের করার অনেক চেষ্টা করেও সফল হননি। যাই হোক, ছেষট্টি বছর বয়সে শিবদাসবাবু মারা যান। তার দু'বছর আগে তাঁর স্ত্রীও চলে গিয়েছেন। মৃত্যুর আগে উইল করে তিনি তার যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে যান শশধরবাবুকে। অন্য ছেলের জন্য কানাকড়িও রাখেননি। উইলে আর একটা জিনিসের উল্লেখ ছিল। যদি কোনও কারণে শশধরবাবুর মৃত্যু হয় তবে সম্পত্তির অধিকার পাবে শশধরবাবুর স্ত্রী ও সন্তান। তবে তাঁরাও যদি জীবিত না থাকেন, সে ক্ষেত্রেই একমাত্র সম্পত্তির অধিকার পাবেন তার ছোট ছেলে।

–তারপর?

–তারপর স্যার শিবদাসবাবু তো সব সম্পত্তি শশধরবাবুকে দিয়ে গেলেন। কিন্তু শশধরবাবু ছিলেন নরম মনের মানুষ। ভাইকে তিনি ফেলে দিতে পারেননি। মাসে মাসে তাকে টাকা দিতেন। কিন্তু সঞ্জয়বাবু সেইসব টাকাই উড়িয়ে দিতে লাগলেন মদ, গাঁজা আর জুয়ায়। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে একদিন বড়রকমের ঝগড়া হয়। ক্ষোভে, অভিমানে শশধরবাবু সেইদিনই কাউকে কিছু না জানিয়ে লখনউ ত্যাগ করে চলে আসেন এই শহরে। এখানে চাকরি জোগাড় করেন, বাড়ি করেন, বিয়েও করেন। ভাইয়ের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখেননি। স্ত্রীর কাছেও ভাইয়ের কথা গোপন রেখেছিলেন। এভাবেই দিন কাটছিল। কিন্তু ওই যে বলে না, মানুষের মন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাইয়ের কথা আরও বেশি করে মনে পড়তে লাগল। লখনউ গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ঠিক করলেন। স্ত্রীকে বললেন, তিনি অফিসের কাজে লখনউ যাচ্ছেন।

–এত সব কথা তুমি কীভাবে জানলে তন্ময়?

–লখনউতে মিস্টার মিত্রের পৈতৃক বাড়ি থেকে আমি একটি ডায়েরি উদ্ধার করি স্যার। ওতে শশধরবাবু তার জীবনের সব ঘটনা লিখে রাখতেন।

–আচ্ছা। তারপর?

–লখনউতে শশধরবাবু তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। ভাইকে তিনি আবার মাসে মাসে টাকা দেবেন কথা দিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে দশবছরেও সঞ্জয়বাবুর এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। জুয়ার নেশায় তখন তার বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা দেনা। শশধরবাবু এ সব কথা জানতে পারলেন এবার শেষবারের মতো লখনউতে গিয়ে।

–শেষবারের মতো? মানে?

–সপ্তাহখানেক আগে লখনউতে গিয়ে শশধরবাবু তাঁর ভাইয়ের হাতে খুন হন। খুনটা সম্ভবত এই টাকার বিবাদকে ঘিরে। তাঁকে খুন করে লখনউয়ের পৈতৃক বাড়িতেই পুঁতে দেন সঞ্জয়বাবু। তারপর তিনি এই শহরে এসে তাঁর বউদির সঙ্গে থাকতে শুরু করেন।

কী আবোল তাবোল বকছ তন্ময়? শশধরবাবুর বডি তো তার ঘরেই পেয়েছি আমরা। আর তুমিই তো বললে শশধরবাবুর স্ত্রী তার দেওরের কথা জানতেন না। তা হলে একজন অচেনা পুরুষের সঙ্গে তিনি থাকতে রাজি হবেন কেন?

–রাজি হবেন যদি সেই পুরুষ অবিকল তাঁর স্বামীর মতো দেখতে হন। তার কারণ, শশধরবাবু আর সঞ্জয়বাবু ছিলেন তার মা–বাবার যমজ সন্তান। বিজ্ঞানের ভাষায় তারা ছিলেন আইডেন্টিকাল টুইনস। ফলে মিসেস মিত্র সঞ্জয়বাবুকে চিনতেই পারেননি। যেমন চিনতে পারেননি প্রতিবেশী ও কলিগরা।

–কী সাংঘাতিক!

–এর পরেরটা শুনুন স্যার। এই আইডেন্টিকাল টুইনসদের কিন্তু চেনা যায় স্বভাবের পার্থক্যে কিংবা অনুভূতি দিয়ে। ঠিক যেভাবে একজন মা তাঁর যমজ সন্তানদের চিনতে পারেন। আমার বিশ্বাস, মিসেস মিত্র ব্যাপারটা ধরতে পারেন গত শনিবার। তিনি ঠিক করেন, খাবারে বিষ মিশিয়ে এই প্রতারককে শায়েস্তা করবেন। সেই মতো তিনি খাবার বানিয়ে রেখে বাড়ি থেকে বেরোন পার্টির উদ্দেশে। সম্ভবত ভেবেছিলেন, পার্টি থেকে যতক্ষণে ফিরবেন, ততক্ষণে সব শেষ। প্রতারক সে খাবার খায়নি।

–খায়নি?

–না। সেদিন সঞ্জয়বাবুর অন্য প্ল্যান ছিল। তিনি রাতেই তার বউদিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ফলে মিসেস মিত্র বাড়ি ফিরতেই তিনি তাকে খুন করেন। খুনটা করার পর তিনি খাবার খেতে যান। ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস দেখুন স্যার, সেই খাবার খেয়েই তাঁকে মরতে হল।

–হুমম। সবই বুঝলাম তন্ময়। কিন্তু আয়নার সেই দাগটা?

–ওটা দাগ নয় স্যার। খাবার খাওয়ার পর সঞ্জয়বাবু ঘরে শুতে এসে বুঝতে পারেন তার মৃত্যু আসন্ন। সে সময় হাতের কাছে কিছু না পেয়ে তিনি আয়নায় কিছু লেখার চেষ্টা করেন। শশধরবাবুর ডায়রিতে তার ভাইয়ের একটা ভালো গুণের কথা আছে। সঞ্জয়বাবু ভালো আঁকতে জানতেন। আঁকার সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। তাই আপনি ভালো করে লক্ষ করলে বুঝবেন স্যার, তিনি আসলে একটা ইংরেজি শব্দ লেখার চেষ্টা করছিলেন।

–কী শব্দ তন্ময়?

–শব্দটা খুব কমন স্যার। শব্দটা হল, স্যরি।

অঙ্কন ঃঅভি

অণুগল্প

মানুষ

সুকান্ত মণ্ডল

আধার কার্ডে শ্রী ঝংকার রায় লেখা থাকলেও গ্রামে সবাই ঝকসু বলেই চেনে। বর্তমানে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় নামের সঙ্গে 'বুড়া' শব্দটা যোগ হয়েছে। জন্মের আগেই ঝকসু বুড়া তার বাবাকে হারিয়েছে। জন্মের বছর তিনেকের মাথায় মা'টাও অজানা রোগে পটল তুলল। তার শেষ সম্বল বুড়ি ঠাকুমাটা লোকের বাড়ি থেকে চেয়ে–মেগে বা কখনও ভিক্ষে করে কোনওরকমে বড় করেছে তাকে। একটা সময় বুড়িও মারা গেল।

বুড়ি যখন মারা যায় তখন ঝকসুর প্রায় দশ–বারো বছর বয়স। লোকের বাড়িতে 'পেট–ভাতা' চাকর হিসেবে দিন গুজরান শুরু হয়। মানুষের বয়স যত বাড়ে টাকার প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। সেই সময় দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় তাকে বলল, 'রিকশা টানলে ইনকামটা ভালো হবে।'

যখন রিকশা টানত তখন কত রকম আরোহীই তার রিকশায় উঠেছে। তবে স্কুল–কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকাদেরই সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে। তাই নিজের ছেলে দু'টোকে পড়াশোনা করিয়ে সে রকমই মানুষ করতে চেয়েছে সে। বড় ছেলে আনন্দ একজন স্কুলশিক্ষক। ছোট ছেলে সমীর এখনও পড়াশোনার পাঠ শেষ করতে পারেনি। কর্মসূত্রে আনন্দ কর্মস্থানের কাছে একটি বাড়ি করে নিজের সংসার নিয়ে দিব্যি আছে। ছোট ছেলে ও বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিয়ে ঝকসু বুড়া গ্রামেই থাকে। দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে বড় ছেলের বাড়িতে কিছু সওগাত নিয়ে গেল সে।

যখন পৌঁছোল ঠিক তখনই ছেলে ও বউমা মেন গেটে তালা মেরে কোথাও বেরোচ্ছে। বাবা এলেও কোনও হেলদোল না দেখিয়েই বরং 'গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকো, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে আসছি' অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট পাঁচ ঘণ্টা হয়ে গেলেও ফিরে এল না তারা। মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে গেল। পাড় ভেঙে গেলে নদী যেমন বড় হয়, মন ভেঙে গেলে মানুষ। ঝকসু বুড়া আত্মহত্যা করে প্রমাণ করে গেল সে 'মানুষ'।

দুখিয়া

মৃণাল কান্তি সরকার

গড়েন এলাকার একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। কী এক অজ্ঞাতকারণে সবাই গড়েনকে দুখিয়া বলে ডাকে। কেউ দুখিয়াদা, কেউ দুখিয়া কাকা, কেউ দুখিয়া চাচা, কেউ শুধুই দুখিয়া ইত্যাদি। সম্বোধনগুলো শুনতে শুনতে গড়েনের বউ কমলার স্বামীর উপর বিরক্তি ধরে যায়। সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে 'তোর কিসের অভাব যে মানষিগুলা সোগায় তোক্ দুখিয়া বলি ডেকায়।

তুই তো এই ঠেকার গিরি (ধনী)। আর মানষিগুলার কাথা শুনিয়া মনে হচ্ছে তুই একটা নাইছালটিয়া। তোর মান সম্মান বলি কিছু নাই নাকি?'

'মুই কি জান? মানষিগুল্যা কেন যে মোক দুখিয়া বলি ডেকায়? তুই ঐলা কাথা চুয়াত ফ্যালে দে। নামত কি আসে যায়? লোকগুলান ভালবাসি ডেকায়। উয়াৎ কি মোর জাত যায়?' — কমলাকে শান্ত করার চেষ্টা করে গড়েন। কমলা গজগজ করতে করতে সংসারের অন্য কাজে মন দেয়।

মানুষের মুখ তো আর বন্ধ করা যাবে না। গড়েন ভাবতে থাকে কীভাবে বউকে একটা জুতসই জবাব দেবে যাতে সে বুঝতে পারে নামে সত্যিই কিছু আসে যায় না। দুখিয়া হলেই দুখী হবে আর সুখিয়া হলেই সুখী হবে এমন দিব্যি কে দিয়েছে? ভাবতে ভাবতে গড়েন বাড়ি থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে দেখে রাস্তার পাশের মাঠে একটি কিশোরী মেয়ে ছাগল চরাচ্ছে। গায়ে মলিন ছিন্ন শাড়ি। নাম লক্ষ্মী। গড়েন ভাবে নাম লক্ষ্মী, ধনের দেবী অথচ গায়ে ছেঁড়া শাড়ি। অতঃপর গড়েনের দেখা মেলে এক হালুয়ার। পরনে কটি বাস। গড়েন জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলে তার নাম ধনী। ধনী! পরনে নেংটি, জমিতে হাল দিচ্ছে! ভাবতে ভাবতে গড়েন নদীর ঘাটে এসে পড়ে। জনৈক সমরবাবুর নামে ঘাটটির নাম সমরঘাট। এমন সময়ে নদী সংলগ্ন শ্মশানঘাটে একদল লোক এক শবদেহ নিয়ে হাজির। দাহ করতে হবে। কৌতূহলবশত গড়েন মৃত ব্যক্তির নাম জানতে চাইলে শোনে প্রয়াত ব্যক্তিটির নাম অমর। অমর! মানে মৃত্যুহীন! হঠাৎ গড়েনের মনে কী ঘটে গেল। সে এক দৌড়ে বাড়ি পৌঁছে বউ কমলাকে ডেকে বলল — 'শোন কমলা, তোক্ একটা শিল্লোক শোনাই' — 'সমরঘাটের অমর মড়া/লক্ষ্মীর না গায়ের শাড়ি ছেঁড়া/ধনী চালায় হাল তয়, মোর দুখিয়া নামটাই ভাল্।'

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক